গুড় মোহিত করেছিল রানি এলিজাবেথকেও

হাসান নীল

আমাদের শৈশব রঙিন করে তোলা খাদ্যদ্রব্যগুলোর মধ্যে অন্যতম গুড়। নাম শুনলেই স্মৃতির ক্যানভাসে ভেসে ওঠে মায়ের শাসন ভুলে বয়াম থেকে গুড় চুরি করে খাওয়ার ছবি। পাশাপাশি উঁকি দেয় দাদার কোলে বসে গুড় মুড়ি খাওয়ার গল্প। রঙিন ছেলেবেলা গুড়ের স্বাদে ও ঘ্রাণে হয়ে উঠত মাতোয়ারা। গুড়ের স্বাদে ও ঘ্রাণে শুধু আমাদের ছেলেবেলা মাতোয়ারা হয়নি, হয়েছিলেন স্বয়ং ব্রিটিশ রানি এলিজাবেথও।

ঘটনাটি চার শ বছর আগের। তখন মোঘল শাসনামল। ভারতবর্ষের মসনদে আছেন চতুর্থ মোঘল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট আকবর। সে সময় ব্রিটিশ শাসনের ভার ছিল রানি এলিজাবেথের হাতে। আকবরের শাসনকালে ভারত সফরে আসেন এলিজাবেথ। প্রভাবশালী শাসক এলিজাবেথের আপ্যায়নে কোনো খামতি ছিল না আকবরের। ভারতের বিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী সব সুস্বাদু খাবারে সাজিয়ে দিয়েছিলেন রানির টেবিল। ওই তালিকায় ছিল দেশের অতি পরিচিত এক মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য। ওই খাবারটি দেখে রানি কৌতুহলবশত তা হাতে তুলে নেন। কিন্তু খানিকটা চাপ দিতেই ভেঙে যায় তা। তখন ভাঙা একটি টুকরো মুখে নিয়ে পরখ করতেই স্বাদে চোখ বুজে আসে তার। রানি এতটাই মুগ্ধ হন যে তিনি এর সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

কী এমন সে খাবার যা রানিকেও উতলা করছিল! সে কথা জানতে আপনারাও নিশ্চয়ই উদগ্রীব হয়ে আছেন। সম্রাট আকবর সেদিন গুড় দিয়েছিলেন রানির টেবিলে। মানিকগঞ্জের হাজারি গুড়। আর এর স্বাদে বুঁদ হয়েছিলেন রানি।

গুড়ের সাথে এদেশের মানুষের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। গুড় তৈরির মৌসুম শীতকাল। শীতকাল মানেই পিঠা পায়েসের ধুম। আর পিঠা পায়েস মানেই তো গুড়। মিষ্টিজাতীয় এ দ্রব্য খেতে খেতে অনেকেই ভাবেন এর উৎপত্তি সম্পর্কে। তবে এ বিষয়ে তেমন কোনো তথ্যের সন্ধান মেলেনি। কিন্তু রানির এই গল্প থেকে বোঝা যায় কয়েক শতাব্দী ধরেই এদেশে পাওয়া যেত এই গুড়। আখ, খেজুর ও তালের রস দিয়ে তৈরি এই মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য তৈরির উপকরণে ভিন্নতার কারণে স্বাদেও রয়েছে ভিন্নতা। গুড় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এই যেমন পাটালি গুড়, চিটা গুড়। এছাড়াও রয়েছে হাজারি গুড়, নলেন গুড় ও ভেলি গুড়।

গুড় তৈরি পদ্ধতি

প্রকারে ভিন্নতা থাকলেও সব গুড় তৈরির প্রক্রিয়া প্রায় একই। প্রথমে আখ কিংবা খেজুরের রস ছেঁকে একটি পাত্রে রাখা হয়। এরপর বড় একটি চুলায় তা জ্বাল করা হয়। এতে করে রসের জলীয় অংশ বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে থাকে সেইসঙ্গে ফুটতে থাকা রসের রঙ ধীরে ধীরে লালচে হতে থাকে। পাশাপাশি ঘনত্বও বাড়তে থাকে। এভাবে দীর্ঘ সময় জ্বাল করার পর উনুন থেকে গরম রস নামিয়ে ঠান্ডা করা হয়। ঠান্ডা হওয়ার সাথে সাথে রসগুলো শক্ত হয়ে পরিণত হয় কাঙ্ক্ষিত গুড়ে।

নলেন গুড়

খেজুর গুড়ের মধ্যে অন্যতম নলেন গুড়। নলেন শব্দটি এসেছে নল থেকে। শীতকালে খেজুর গাছ রসবতী হয়। এ সময় রস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চাষীরা হাসুলি (বড় কাস্তে জাতীয়) দিয়ে গাছের বাকলের কিছু অংশ চেঁছে (কেটে) তুলে ফেলেন। এরপর বাঁশের ফাপা কঞ্চি ভালো করে কেটে নল তৈরি করে বাকল তুলে ফেলা অংশে স্থাপন করেন। বিকেলবেলা গাছে যখন তারা হাঁড়ি বাঁধেন তখন নলের মুখ হাঁড়ির সাথে সংযোগ করে দেন। ওই নল দিয়েই খেজুর রস এসে হাঁড়ি

ভর্তি হয়ে যায়। পরদিন সকালে তা সংগ্রহ করে আগুনে জ্বালিয়ে তৈরি করা হয় গুড়। নল দিয়ে গুড়ের প্রধান উপকরণ সংগ্রহের কারণেই এই গুড় নলেন গুড় নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে। নলেন গুড়ের বেশিরভাগ যোগান আসে যশোর কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে। এই অঞ্চলের চাষীদের বড় একটি অংশের জীবিকা নির্ভর করে নলেন গুড়ের ওপর। তাই শীত এলেই এ অঞ্চলের চাষীদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। বিকেল হলেই তারা হাঁড়ি হাসুলি নিয়ে বেরিয়ে রস সংগ্রহের বন্দোবস্ত করতে।

হাজারি গুড়

ঢাকার পার্শবর্তী জেলা মানিকগঞ্জ যেসব কারণে বিখ্যাত তার একটি হলো হাজারি গুড়। খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে এই গুড় তৈরি করা হয়। সময়ের সাথে সাথে গুড় তৈরির পদ্ধতি বদলে গেলেও বদলায়নি হাজারি গুড় তৈরির প্রক্রিয়া। এখনও এই গুড় তৈরি করা হয় আদি প্রক্রিয়ায়। মানিকগঞ্জের চাষীদের মতে হাজারি গুড় উৎপাদনের উপযুক্ত সময় তীব্র শীত। হাড় কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে এই গুড় তৈরিতে নেমে পড়েন চাষীরা। আগের দিন বিকালে গাছিরা খেজুর গাছ কেটে তাতে হাঁড়ি বেঁধে দেন। পরদিন ভোরবেলায় গাছ থেকে রস নামিয়ে ছেঁকে পরিষ্কার করা হয়। এরপর ওই রস মাটির বা টিনের তৈরি পাত্রে ঢেলে আগুনে জ্বাল দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় কাশের নাড়া। তবে সব রসে হাজারি গুড় তৈরি হয় না। এজন্য প্রয়োজন হয় মিষ্টি ও টলটলে রস। তবেই তৈরি হয় সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন হাজারি গুড়। এই হাজারি গুড়েই মুগ্ধ হয়েছিল রানি এলিজাবেথ। উপহার স্বরুপ হাজারি গুড় চাষিদের উপহার দিয়েছিলেন হাজারি লেখা একটি সীল।

পাটালি গুড়

খেজুর রস সংগ্রহ করে মাটির বা টিনের পাত্রে নিয়ে জ্বাল দিয়ে ঘন করে যে গুড় তৈরি করা হয় সেটিই পাটালি গুড়। এগুলো ছোট বড় মাঝারি বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। আখেরও পাটালি গুড় হয়। তবে আখের পাটালি সাধারণত আকারে বড় ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চতুর্ভুজ আকারের হয়ে থাকে। অন্যদিকে খেজুর গুড়ের পাটালি ৫০০ গ্রাম বা তার থেকে কিছু বেশি হয়ে থাকে। আকারে গোলাকার।

আখের গুড়

আখের গুড় স্বাদে বা গুণে খেজুর গুড়ের চেয়ে কোনো অংশে কম। উপকরণ ভিন্ন হলেও তৈরি প্রক্রিয়া একই। শীতকাল এলেই এদেশের আবাদি জমিগুলো দখল করে নেয় আখ গাছ। মাঠের পর মাঠে ঘ্রাণ ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই আখ দিয়ে তৈরি করা হয় আখের গুড়। সে এক মহা কর্মযজ্ঞ। আখ গাছগুলো পরিপক্ব হয়ে উঠলে সেগুলো কেটে ওই জমিতেই শুরু হয় গুড় তৈরির প্রক্রিয়া। প্রথমে আখ মাড়াই করে তা থেকে রস বের করা হয়। বড় চুল্লিতে বসানো হয় বিশাল পাত্র। এরপর ওই পাত্রে আখের রস ঢেলে জ্বাল করে তৈরি হয় আখের গুড়। গ্রাম বাংলায় আখের গুড়ের শরবতের বেশ খ্যাতি রয়েছে। গরমের দিনে বা পেটের পীড়ায় আখের গুড়ের শরবত বেশ উপকারি। আখের গুড়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালরি আর শর্করা। এ কারণেই ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীকে আখের গুড়ের স্যালাইন খাওয়ানো হয়। এতে বিদ্যমান শর্করা শরীরে পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে।

চিটা গুড়

চিটা গুড় সাধারণত মানুষের খাওয়ার অযোগ্য। এই গুড় পাওয়া যায় চিনি তৈরির সময়। গুড় তৈরির রস যতটা জ্বাল দেওয়া হয় চিনি তৈরিতে তার চেয়ে দ্বিগুন জ্বাল প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত জ্বালের ফলে গুড়ের রঙ হয় কালো, স্বাদে হয় তিতকুটে। এই গুড় গবাদি পশুকে খাওয়ানো হয়।

গুড়ের বাজার

এবার চলুন জেনে নেই গুড়ের বাজার সম্পর্কে। গুড় উৎপাদন মৌসুম সাধারণত শীতকাল। খেজুর গাছ যেমন শীতকালে রসবতী হয় তেমনই আখও ফলে শীতে। তাই সারা বছর গুড় পাওয়া গেলেও বাজারটা জমে ওঠে শীতকালে। এ সময় বাজারে ওঠে নতুন গুড়। এছাড়া হেমন্ত আসতেই দেশে জমে ওঠে পিঠা পুলির উৎসব। এ সময় গুড়ের চাহিদাও থাকে অন্য সময়ের তুলনায় বেশি। ফলে এসময় নগর গ্রাম সর্বত্রই বাজারগুলোতে জমে ওঠে গুড়ের পসরা। তবে দেশব্যাপী অনলাইনের প্রসারে অন্যান্য পণ্যের মতো গুড়ও পাওয়া যায় অনলাইনে। দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা, ঝুট ঝামেলা পেরিয়ে বাজারে যাওয়ার ফুসরৎ না মেলে তারা অনায়াসেই বিভিন্ন অনলাইন শপ থেকে গুড় সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়া বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে গুড়। সুইজারল্যান্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চাষীর হাতে তৈরি গুড় চলে যাচ্ছে অনায়াসে।